Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 872 - 882
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উপনিবেশিত বিশ্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা : প্রসঙ্গ ‘সভ্যতার সংকট’

রাকিবুল হাসান
প্রভাষক, বাংলা
ডিপার্টমেন্ট অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস
বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
Email ID : rakibulhasanbangla440@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rabindranath Tagore, The Crisis of Civilization, Colonialism, Post-Colonialism, Imperialism, Cultural identity, Globalization.

Abstract

This research explores the contemporary relevance of Rabindranath Tagore's thoughts on the colonized world, particularly as articulated in his essay “The Crisis of Civilization” (Sabhyatar Sankat). Written during the later years of Tagore's life, the essay critiques the Western concept of civilization and its detrimental impact on India during the colonial period. Tagore argues that this notion has fueled the exploitation and oppression of colonized nations, urging Indians to reclaim their cultural heritage and reject the imposition of foreign values.

The study aims to analyze the themes within the essay, with a focus on its critique of imperialism and the lasting legacy of colonialism. It will investigate how Tagore's insights remain significant in today's post-colonial context, where many nations continue to grapple with the ramifications of their colonial histories. The research highlights Tagore's warning against blind imitation and unquestioning obedience while encouraging critical thought regarding dominant ideologies.

By contributing to the discourse on post-colonialism and decolonization, this study underscores the necessity for renewed critiques of Western values and institutions. Furthermore, it illustrates how Tagore's perspectives continue to resonate in contemporary discussions surrounding globalization, imperialism, and cultural identity.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

১

'সভ্যতার সংকট' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১ - ১৯৪১) জীবনের শেষপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এটি পরে তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর আশি বছর পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি যে বিশ্বাস নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন, তা দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে। এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের আত্মসমালোচনার অপূর্ব উদাহরণ, একই সাথে পাঠকেরও জীবন জিজ্ঞাসার পথনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, প্রথম দিকে সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেন তিনি এই মহিমার বোধ তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল ইংরেজি সাহিত্য ও ভাবুকদের নানান ভাবাদর্শ। এমনকি তিনি এও মনে করেছিলেন যে বিজিত জাতির স্বাধীনতাবিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কিন্তু পরে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি রসসম্ভোগের জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গ তিনি নিজেই জানাচ্ছেন সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। তথাকথিত সভ্যতাকে এভাবেই এই শাসকরা 'রিপুর প্রবর্তনায়' অনায়াসে লঙ্ঘন করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, 'বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির' কী অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য। এভাবেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এখানেই তাঁর আত্মচেতনার জাগরণ এবং পাঠকের নিদ্রাভঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, একদা ইংরেজ জাতির প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তবে তিনি যে সেই আকর্ষণজাল ছিন্ন করেছেন এবং কেন করেছেন তারও কারণসমূহ তিনি উল্লেখ করেছেন। অন্ধ অনুসরণ, বিনা প্রতিবাদে শাসকের হাতে অবলীলায় শোষিত হওয়া যেকোনো জাতির পক্ষে লজ্জাজনক তাই যেন রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি আমাদের শিক্ষা দেয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, উপনিবেশিত দেশগুলো এখনো সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে বের হতে পারেনি। আমাদের এই বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভ্যতার সংকট প্রবন্ধটি আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে কীভাবে প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরাই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাঁর লেখায় আমরা কেবল নতুন রূপকল্পই চিত্রিত হতে দেখি না, বাঙালির বাস্তব জীবনের স্বাদ আর সৌরভ, আশা আর আনন্দ, দুঃখ আর বেদনার শব্দপ্রতিমা যেন খুঁজে পাই প্রতিটি লেখায়। একজন বিশ্বের কবি হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশসহ পুরো বিশ্বকে নিয়েই তিনি ভেবেছেন। তাঁর এই ভাবনার প্রকাশ আমরা পাই জীবনের শেষ পর্যায়ের লেখায়। জীবনের শেষের দিকের প্রতিটি রচনায় তাঁর লেখকসত্তায় ভিন্ন মাত্রা তৈরী করে। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মম বলি হওয়া পৃথিবীর সর্বত্র সভ্যতার সংকটের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। যা তাঁর লেখক সত্তায় ভিন্ন আঙ্গিক তৈরী করে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের তুঙ্গ পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধে তাঁর ভাবনার কথা জানান। কলকাতার নাগরিক জীবনের ওপর ঔপনিবেশিক শাসনের নানামাত্রিক রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায়, বিশেষত প্রবন্ধে উপনিবেশিত বাংলার বহুমাত্রিক রূপ শিল্পিতা পেয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় মানবসম্পর্ক কীভাবে নষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্নতায় রূপ নিয়েছে, কীভাবে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসন পুরো পৃথিবীকে তাঁদের ইচ্ছের গোলাম বানাচ্ছে তা রবীন্দ্রভাবনায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। বলা যায়, উপনিবেশের অধিবাসী হয়েও উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনায় বাংলার মানুষের আত্মিক ও জাগতিক মুক্তির কথা উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধ তাঁর এই নতুন জীবনবাদ উচ্চারণের অভ্রান্ত সাক্ষী হয়ে আছে। ভাবতে বিস্ময় লাগে, শতবর্ষের অধিককাল আগে ঔপনিবেশিক শাসনের যে-কদর্য রূপ রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেছেন, সে-সময় অধিকাংশ ভারতীয় ভাবুক-চিন্তাবিদ মোহগ্রস্ত ও আচ্ছন্ন ছিল পাশ্চাত্য চিন্তাচর্চায়। জীবনের শুরুর দিকের রচনায় আমরা যেই রবীন্দ্রনাথকে পাই শেষ দিকের রচনায় আমরা পাই অন্য এক রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ উপনিবেশিত সমাজ কাঠামোর পটভূমিতে বেড়ে উঠেছেন। উপনিবেশিত সমাজে বসবাস করেও তিনি উত্তর উপনিবেশিক চিন্তা করতে পেরেছেন এক কালোত্তীর্ণ প্রতিভাবলে। অনেকে ইউরোপের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগকে বড় করে দেখান। কিন্তু বিষয়টি এত সরলরৈখিক নয়। প্রথম জীবনে বিলেতি সভ্যতার প্রতি কিছু মোহমুগ্ধতা থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর

চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে। তাঁর 'সভ্যতার সংকট' এর সবচেয়ে বড় দলিল। তিনি উপনিবেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের বোধকে অগ্রাহ্য করে প্রাচ্যের জ্ঞানতত্ত্বকে পশ্চিমের সামনে তুলে ধরেছেন। পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদী ডিসকোর্সের পরিবর্তে উপস্থিত করেছেন প্রাচ্যের মানবিক ডিসকোর্স। আর এভাবেই তিনি গড়ে তুলেছেন উপনিবেশবাদবিরোধী মতাদর্শিক বৌদ্ধিক প্রতিরোধ। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনের নানামাত্রিক ছবি, একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিপ্রতীপে কোথায় আছে দ্রোহের উৎস তার সন্ধানও। উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের আলোয় কীভাবে ঘটবে মানুষের আত্মিক মুক্তি তারও অভ্রান্ত ইঙ্গিত আছে রবীন্দ্রনাথের এই লেখায়। এই প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকট প্রবন্ধের পাঠ অনুসরণ করে ঔপনিবেশিত বিশ্বের সংকট ও ঔপনিবেশিত বিশ্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার দিকটি উন্মোচন করার চেষ্টা করবো।

২

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই সাহিত্য-শিল্পকলা-রাজনীতি ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে বিশেষ করে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব একটি বিশেষ মনোযোগের জায়গা দখল করে নেয়। এসব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক এবং ধারণাগত অনুসন্ধিৎসা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা জানি, সতেরো-আঠারো বা উনিশ শতকে ইউরোপ সমুদ্রপথে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় নিজেদের সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেছিল। তাদের এই সাম্রাজ্য বিস্তারের মূল উদ্দেশ্য ছিলো বাণিজ্য। মূলত, বাণিজ্যের ছদ্মাবরণে ইউরোপ এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার শাসন ক্ষমতা দখল করেছে, লুণ্ঠন করেছে তাদের দেশ থেকে অধিকৃত সম্পদ, প্রচার করেছে খ্রিষ্টবাদ। একের পর এক সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে ইউরো-মানসিকতায় এক ধরনের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের জন্ম দিয়েছিল, সৃষ্টি করেছিল কালো-মানুষের ওপর সাদা-মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এবং এরই অনুষঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল সাদা-কালো প্রভু-দাসের অমোচনীয় যুগ্ম-বৈপরীত্য (binary-opposition)। পাঠক, সভ্যতার সংকট প্রবন্ধ অনুসারে ইউরোপীয় উপনিবেশের ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী যে সংকট তৈরি হয়েছিল তা আমরা একটু পরই দেখবো।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পনেরো শতক থেকে সমুদ্রজয়ের মাধ্যমে অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করা শুরু করে। তাদের এই সাম্রাজ্য বিস্তার শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না তা ছিল তথ্য-উপাত্ত ও জ্ঞানভাণ্ডার জয়ের অনন্ত অভিযাত্রা। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ও ভূগোলজ্ঞানের মাধ্যমে ইউরোপ অন্যদের (native) দুর্বলতা ও সম্পদ সম্পর্কে যেমন অবহিত হয়েছিল, তেমনি ধারণা লাভ করেছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তথা শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে। বোধকরি এ-কারণেই কথাকোবিদ ফ্রানৎস্ কাফকা ইউরোপের সমুদ্রজয়কে আখ্যায়িত করেছিলেন জ্ঞানযন্ত্র বা knowledge machine অভিধায়। নবলব্ধ এই জ্ঞান দ্বারা ইউরোপ যে যুগ্ম-বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল, ঔপনিবেশিক দেশগুলো তা গভীরভাবে অনুসরণ করতে শুরু করে, বিজিত দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেয় সে যুগ্ম-বৈপরীত্য এবং বিজিত দেশের মানুষদেরও, তাদের দৃষ্টিতে যারা অপর (other), বাধ্য করায় সে যুগ্ম-বৈপরীত্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে। এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের কিছু নমুনা এরকম : শাসক-শাসিত, সাদা-কালো, সভ্য-অসভ্য, উন্নত-আদিম, গতিশীল-স্থবির, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, মানবিক-পাশব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, জ্ঞানী-মূর্খ, চিকিৎসক-রোগী, কেন্দ্র-প্রান্ত ইত্যাদি। লেখাই বাহুল্য, এসব যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথমটি নির্দেশ করে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিকে আর দ্বিতীয়টি উপনিবেশিত পৃথিবীকে। ইউরোপ বোঝাতে চেয়েছিল, যা কিছু ভালো সুন্দর মানবিক এবং যৌক্তিক তার সবটাই ইউরোপের; উপনিবেশিত পৃথিবী কেবলই অসুন্দর ইতর মূর্খ অমানবিক আর প্রান্তিক। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিকৃত ভূখণ্ড ও মানবমণ্ডলী (natives) সম্পর্কে একটা পার্থক্যসূচক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে দিলো ইউরোপ। এই পার্থক্য সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনোজাগতিক – সব দিকেই ক্রমে প্রভাব বিস্তার করল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমালোচকের এই মন্তব্য -

> "Colonialism could only exist at all by postulating that there existed a binary opposition into which the world is divided. The gradual establishment of an empire depended upon a stable hierarchical relationship is which the colonized existed as the other of the colonizing culture. Thus the idea of the savage could occur only if there was a concept

> of the civilized to oppose it. In this way a geography of difference was constructed, in which differences were mapped (cartography) and laid out in a metaphorical landscape that represented not geographical fixity, but the fixity of power. Imperial Europe became defined as the 'centre' in a geography at least as metaphysical as physical. Everything that lay outside that centre was by definition at the margin of the periphery of culture, power and civilization."[১]

ঔপনিবেশিক শক্তি চায় কেন্দ্র-প্রান্তের এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের সম্পর্কটি দৃঢ়বদ্ধ ও অবিচল রাখতে। যুগ্ম-বৈপরীত্যসূচক সম্পর্কের অবিচলতার ওপরই নির্ভর করে উপনিবেশকের সাফল্য ও স্থায়িত্ব এবং বিজিত জনগোষ্ঠীকে হীনবল রাখার প্রত্যাশিত সফলতা। ফলে ইউরোপের সমুদ্রবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলোতে কেবল বাণিজ্য-পণ্যই নয়, অধিকৃত ভূখণ্ডে চালান হতে থাকে আরো অনেক কিছু – ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, পোশাক, প্রশাসন, এমনকি মানবিক চিন্তন-প্রক্রিয়া পর্যন্ত, যেগুলোর একমাত্র লক্ষ্য ছিল উপনিবেশ ও তার অধিবাসীদের ওপর রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও মানসিক আধিপত্য বিস্তার। ঔপনিবেশিক শক্তির অব্যাহত প্রচেষ্টায় উপনিবেশিতের মনে উপনিবেশী সংস্কৃতির প্রতি সৃষ্টি করে এক অমোঘ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবোধ এবং একই সঙ্গে আপন ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি হীনমন্যতাবোধ। স্মরণ করা যাক ফানোর ভাষ্য -

> "উপনিবেশবাদ শুধু জনগোষ্ঠীকে এর আয়ত্তে শৃঙ্খলিত করেই তৃপ্ত থাকে না, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মস্তিষ্কের বিকাশ ও ঘিলু অসার করে দেয়। কোনো এক বিকৃতবুদ্ধি যুক্তির মাধ্যমে লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ করা হয় এবং তাদের বিকৃত অবয়বহীন এবং ধ্বংস করা হয়।"[২]

এভাবে আধিপত্যবাদী দর্শন সাম্রাজ্য বিস্তারে ইউরোপীয়দের শক্তি জুগিয়েছে – পৃথিবীকে করেছে লুণ্ঠন। উনিশ-বিশ শতকে আধিপত্যবাদী এই শক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড। একইভাবে ভারতবর্ষও বন্দি হয়ে পড়ে ঔপনিবেশিক শক্তির এই সাংস্কৃতিক-জালে। উপনিবেশী শক্তির এই প্রচেষ্টা টমাস বেবিংটন মেকলের বিখ্যাত উক্তি থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। উপনিবেশিত 'অপর'দের 'সাদা মুখোশ' (white masks) পরানোর কৌশল হিসেবে মেকলে লিখেছেন -

> "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect."[৩]

– অর্থাৎ বিজিত দেশে শিক্ষা বিস্তারের মূল লক্ষ্য হিসেবে উপনিবেশী শক্তি সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এই পরিকল্পনারই প্রত্যক্ষ ফল উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। উপনিবেশী শক্তির এই বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্বরূপ উন্মোচিত হয় থিয়োঙ্গোর ভাষ্যে -

> "সমষ্টিগত প্রতিরোধীদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ সবচেয়ে বড় যে অস্ত্র পরিচালনা করেছে, সেটা হলো সাংস্কৃতিক বোমা। এই সাংস্কৃতিক বোমার লক্ষ্য হলো মানুষের নিজেদের পরিচয়, নিজেদের ভাষা, নিজেদের প্রতিবেশ, নিজেদের সংগ্রামের ঐতিহ্য, নিজেদের ঐক্য, নিজেদের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি খোদ নিজেদের ওপর থেকেই বিশ্বাস নষ্ট করে দেওয়া। নিজেদের অতীতকে অর্জনহীন এক পোড়ো ভূমি বলে পরিচয় করাতে চায় এবং মানুষের মধ্যে নিজ ভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভের স্পৃহা তৈরি করার প্রয়াসে থাকে এই সাংস্কৃতিক বোমা।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশ্ব মানবিকতার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ সতত চলেছেন তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়ে। মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের সেই অমিয় বাণীই রবীন্দ্রনাথের জীবনে চিরসত্য 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বিশ্বের যে সমস্ত রাষ্ট্রিক সঙ্কট প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা সভ্যতার সংকটে অকপটে স্বীকার করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি নিজের আত্ম সমালোচনার পাশাপাশি ইংরেজদের তৈরিকৃত বিশ্বব্যাপী যে সংকট প্রত্যক্ষ করেছেন তা হল -

১. উপনিবেশিত রাষ্ট্রের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার।
২. সাম্রাজ্যবাদের নামে সন্ত্রাসবাদ, দমন, পীড়ন, শোষণ ও ঔপনিবেশবাদ।
৩. দুই বিশ্বযুদ্ধে মানবসভ্যতার চূড়ান্ত সংকট।
৪. ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতে সৃষ্টি করছে ভেদ ও ধর্মবিদ্বেষ।
৫. ভারতের মতো দরিদ্র নিঃস্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আত্মবিচ্ছেদ ও আত্মপরাভবের ঘটনা।
৬. ন্যাশনালিজম।

নিজেদের ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে ইংরেজরা প্রথমেই যে জায়গায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলো তাহলো উপনিবেশিত দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য বিস্তার। বলা প্রাসঙ্গিক যে, এক্ষেত্রে তারা শতভাগ সফল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার এই প্রবন্ধে বলেছেন, এমন একটা সময় ছিলো ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা, শেক্সপিয়রের নাটক, বায়রনের কবিতা, বার্কের বাগ্মিতা আর মেকলের ভাষা নিয়ে আলোচনা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রেখেছে। ইংরেজি সাহিত্য ও ভাষার প্রতি এই টান রবীন্দ্রনাথের জীবনের শুরুর দিকে ছিলো খুবই প্রবল। ইংরেজদের এই প্রবণতার দিকে রবীন্দ্রনাথের ছিলো একনিষ্ঠ আস্থা ও বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় পারিবারিক প্রভাবের কথা যেটুকু বলা হয়েছে তা পাল্টাতে শুরু করে ১৮৯০ সালের শেষের দিকে জমিদারির কাজে পূর্ববঙ্গে চলে আসার পর। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যাক রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য -

> "My banished soul sitting in the civilized isolation of the town-life cried within me for the enlargement of the horizon of its comprehension. I was like the town-away line of a verse, always in a state of suspense, while the other line, with which it rhymed and which could give it fullness, was smudged by the mist away in some undecipherable distance."[৫]

এই প্রবন্ধে তাকে বলতে শুনি, ইউরোপের জ্ঞান ও বিজ্ঞান একদিন সমস্ত মানব জাতিকে পথ দেখাবে বলে ভাবা হয়েছিল, সেই ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর বুকে ডেকে এনেছে ধ্বংসের তাণ্ডব। নিজেদের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে।

> "একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংল্যান্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংল্যান্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়েই ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলাম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।"[৬]

কিন্তু ইংরেজ সম্পর্কে এই শ্রদ্ধার বোধ বর্তমান পরিস্থিতিতে আর বজায় রাখা সম্ভব নয় বলেই মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিগত কয়েক দশক জুড়ে ইংরেজরা পৃথিবীর উপর যে অমানবিক তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে তাতে তাদের অতীত গৌরব ধূলিসাৎ হয়েছে। জ্ঞানের অগ্রদূত হয়ে যারা ভারতবর্ষে এসেছিলেন, অচিরেই তাদের মধ্যে দেখা দিল বর্বরতার চূড়ান্ত

প্রকাশ। মানবতার দূত হিসাবে যাদের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া, তারাই বিশ্বজুড়ে মত্ত হল মানবতা লঙ্ঘনের খেলায়। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখেছেন,

> "প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কি অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।"[৭]

বিশ্বব্যাপী উপনিবেশিত অঞ্চলগুলোতে ভাষাগত যে সংকট রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন তা এই প্রবন্ধের পরতে পরতে যেন তিনি ব্যক্ত করেছেন। আমরা পাই এক দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে। ইংরেজদের চাপিয়ে দেওয়া ভাষার এতই প্রভাব যে বর্তমানেও আমরা উপনিবেশিত অঞ্চলগুলোতে তাদের ভাষার প্রভাব দেখতে পাই।

বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের প্রতি এই টান অনুভব করেছেন পারিবারিক প্রভাবের ফলশ্রুতিতে, পাশাপাশি নিজের জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে। বিশেষ করে, যৌবনের শুরুর দিকে যখন ইংল্যান্ডে যান তখন সেখানে ব্রাইটের কণ্ঠে চিরকালের ইংরেজের বাণী শুনেছিলেন যা জাতিগত সীমা অতিক্রম করে তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ-অভিজ্ঞতা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সবসময় এই ধারণা মনে লালন করেছেন যে, মানব-মনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিগুলো কখনো জাতিগত সীমায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। মেকলের 'এডুকেশন মিনিট'- কে আমরা যেভাবেই মূল্যায়ন করি না কেন এবং তার ফল যেভাবেই ভোগ করি না কেন, খোদ মেকলে এর মাধ্যমে তো তা-ই চাইছিলেন। সে-সময় কিছু ইংরেজ অবশ্য আশঙ্কা করেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটলে ভারতীয়রা আত্মসচেতন হয়ে উঠবে এবং তারা সুযোগ বুঝে স্ব-শাসনও চাইবে– তখন এ-কথা শুনে জাতিগর্বী মেকলে বলেছিলেন – "whenever it comes, it will be the proudest day in the English History।"[৮] কার্যত তা-ই হয়েছিল।

পৃথিবী বিস্তৃত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ছিল শাসক হয়ে শোষকের ভূমিকায়। তাদের সাম্রাজ্যবিস্তারের নামে শোষণের চিত্র আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের বয়ানে *সভ্যতার সংকট* প্রবন্ধে। উইল ডুরান্টের একটি বিখ্যাত বই *দি কেস ফর ইন্ডিয়া। এই বইটি ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদের ভয়ংকর রূপ প্রকাশিত হতে দেখি।* উইল ডুরান্ট আমেরিকায় বসে যে-ভারতকে জেনেছিলেন, এখানে এসে অন্য এক ভারতকে দেখলেন, তাঁর দেখা ভারতের বিবরণই হল *দি কেস ফর ইন্ডিয়া*। অন্য কোনো দেশে তিনি ব্রিটিশদের দেখেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু এখানে তিনি ভারতীয়দের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখেছেন। ইউরোপীয়রা যদিও বলেছিল কুসংস্কার আর জনসংখ্যার আধিক্যই এই মৃত্যুর কারণ, কিন্তু, তাঁর মতে, এর মূল কারণ ইতিহাসের নিষ্ঠুর জঘন্য শোষণ। উইল ডুরান্টের এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ সালে, নিউইয়র্ক থেকে; আর ১৯৩১ সালে দি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যে - আলোচনা লেখেন তা পড়লে বোঝা যায় তিনি তখন আর কোনোভাবে এদেশে ব্রিটিশ-শাসন চাচ্ছেন না; তাই বলছেন - 'ব্রিটিশদের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বাধীন হবে, ভারত এই স্বপ্ন দেখলেও বিরক্ত হন এমন কিছু মার্কিন আমি দেখেছি। একদিন মানুষের যে অধিকার অর্জন করতে তারা নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, আমরাও যে সেই লড়াইয়ের কথা ভাবছি এটা তাদের অসহ্য ঠেকে।' ব্রিটিশদের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি নিয়ে তখনই চিন্তা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তার একদশক পরে 'সভ্যতার সংকট'-এ দেশভাগ ও স্বাধীনতার পরিণামদর্শীর ভূমিকায় কথা বলছেন -

> "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এ ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ এমন একটি সাম্রাজ্য চান যেখানে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, রাজনৈতিক স্থিরতা, নীতিগত উন্নতি এবং জ্ঞান ও শিল্পচর্চা পাকাপোক্ত ভাবে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনানুযায়ী তার জীবনের শুরুর দিকে সভ্যতার সব উপাদানই তিনি দেখেছেন ইউরোপীয়দের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে তিনি ফরাসি মনীষী গিজোর বইয়ের আলোকে লিখেছেন, এশিয়া, প্রাচীন গ্রিস ও রোম সকল সভ্যতায়ই রয়েছে একধরনের একমুখী ও স্থায়ী ভাব, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি বহুমুখী, বিচিত্র, জটিল ও বিক্ষুব্ধ। এর মধ্যে সমাজতন্ত্রের মূলতত্ত্ব, লৌকিক, আধ্যাত্মিক, রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র প্রজাতন্ত্রসহ সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায় বিজড়িত, এরা যেন পরস্পর লড়াই করছে— এই যে এত বৈচিত্র্য, তার মধ্যেও রয়েছে এমন এক পারিবারিক সাদৃশ্য, তাতে তাকে ইউরোপীয় বলে চেনা যায়। এই সভ্যতার প্রতিই আগ্রহী রবীন্দ্রনাথ। সংকীর্ণ ভূগোল-খণ্ড আর আচারের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং মনু-প্রবর্তিত যে— 'সদাচার' — রবীন্দ্রনাথের মতে যাকে আমরা 'সিভিলিজেশন' বলি — তার শীলিত রূপের সঙ্গে অথবা তার জায়গায় ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শকে ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর ঠিক এজন্যই তাঁকে কঠিন দুঃখ পেতে হয়েছে, বিচ্ছেদ সইতে হয়েছে এবং তাঁর বিশ্বাসও ভঙ্গ হয়েছে। মৃত্যুর একেবারে কাছাকাছি গিয়ে তিনি নিজের ইংরেজ প্রীতির সমালোচনা করেন। প্রবন্ধটি হয়ে উঠে তাঁর আত্মসমালোচনার দলিল। তিনি মনে করেন ইংরেজরা বিশ্ব এবং ভারতবর্ষকে যে সভ্যতা উপহার দিয়েছে তার মূলে রয়েছে শোষণ ও বঞ্চণার করুণ আর্তনাদ। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি একটি অনিশ্চিত আশাবাদের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে, তিনি বলেছিলেন -

> "আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, একদিন সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে ওই পূর্বদিগন্ত থেকেই।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্ব-রাজনীতি পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ তুলে এনেছেন বিশ্বের অন্যান্য দেশেও সভ্যতাগর্বী ইংরেজ কি নিষ্ঠুর তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। চীনের অহিফেন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২) তেমনই এক আগ্রাসন। চীনে ইউরোপীয় দেশগুলির অবাধ বাণিজ্য নিষিদ্ধ ছিল। এ সময় চীনে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে আফিমের ব্যাপক চাহিদা ছিল। ইংরেজ বণিকেরা চোরাপথে চীনে প্রচুর পরিমাণে আফিম সরবরাহ করতে থাকে এবং কালক্রমে তা চীনাদের নেশায় পরিণত হয়। আফিমের কুপ্রভাব থেকে দেশবাসীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ক্যান্টন বন্দরে ২০ হাজার পেটি আফিম বাজেয়াপ্ত করে (১৮৩৯) ধ্বংস করে চীনা সরকার। ক্ষুব্ধ ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে চীনের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। চীন তা অগ্রাহ্য করলে শুরু হয় প্রথম অহিফেন যুদ্ধ। শক্তিশালী ব্রিটিশরা সহজেই চীনকে পরাজিত করে। স্পেন থেকে শুরু করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে একই ভাবে ইংরেজেরা নিজেদের মানবতাবিরোধী কর্মধারাকে বজায় রেখেছে শক্তির মদমত্ততায়। অন্য দেশের সম্পদ লুঠ করে এনে নিজেরা হয়েছে সমৃদ্ধতর। ইংরেজকে অনুসরণ করে ফরাসী, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরাও নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষকে লুণ্ঠনের খেলায় মেতে উঠেছে। তাদের সেই লোভের কারণে ঘটে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের অবক্ষয় দেখে মনে হয়েছিল এমন কালো সময় হয়তো আর পৃথিবীর বুকে কোনওদিন আসবে না। কিন্তু তা থেকেও ইংরেজ সহ ইউরোপের দেশগুলি কোনও শিক্ষা নেয়নি। শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার দিয়ে লিখেছেন, -

> "এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।"[১১]

ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতের মতো দরিদ্র নিঃস্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আত্মবিচ্ছেদ ও আত্মপরাভবের ঘটনা ঘটানোর পাশাপাশি সৃষ্টি করছে পারস্পরিক ভেদ, ধর্মবিদ্বেষ ও আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম দিকের যে ধারণা তা আমরা সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে গিয়ে ভিন্নতর রূপ দেখি। ইংরেজ-শাসনের কারণে অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা ও আরোগ্যের যে- শোকাবহ অভাব তৈরি হয়েছে তা আমাদের নিজস্ব সমাজ-শক্তির জোরেই হয়ত পূরণ করা সম্ভব, সে-কারণে এই অভাবের চেয়েও আমাদের মধ্যকার 'আত্মবিচ্ছেদ'-এর ঘটনাটিকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'অতি নৃশংস'। এই বিচ্ছেদ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার বিচ্ছেদ, যা নৃশংস, যার নেপথ্যে রয়েছে ভারত-শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরের কোনো গোপন কেন্দ্রের ভূমিকা।

হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদ বিষয়ে শেষমেশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও নানা সময়ে, নানা সংকটে বিষয়টি নিয়ে তিনি ভেবেছেন তারও বহু আগে থেকেই। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কী, কালিদাস নাগের এমন একটি প্রশ্নের জবাবে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ইউরোপ যেভাবে সত্য সাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির মাধ্যমে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে, আমাদের হিন্দু-মুসলমানকেও সেভাবে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। ধর্মকে কবর বানিয়ে সমগ্র জাতিকে সেই 'ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে' উন্নতি হবে না, মিলবারও উপায় থাকবে না।

তারপর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে লিখিত তাঁর 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে দুই ধর্মমত এবং সমাজরীতির প্রভেদ ও বিরুদ্ধতার কথা স্বীকার করেও বলেছিলেন, এই সব সত্ত্বেও আমাদেরকে মিলতে হবে; এবং রাষ্ট্রিক অধিকার আদায় বিষয়ে দর-কষাকষি করে দুই সম্প্রদায়ের মন-কষাকষি বাড়িয়ে শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধন করা ঠিক নয়। তবে একথাও বলেছেন যে, স্বার্থের জন্য শেষ পর্যন্ত পলিটিক্সের তালি-দেওয়া মিলনকে সমর্থন করেন না। এর কারণ, যেখানে গাছের গোড়ায় বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে জল ঢেলে গাছকে চিরদিন সজীব রাখা যায় না, তাই একদম গোড়ায় গিয়ে আমাদের মিলতে হবে। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব, এই বিষয়ে তখনো, ১৩৩৮ সালেও, সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে ভেবে দেখা হয়নি বলে স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এক সময় খেলাফতকে সমর্থন করে গান্ধি যে মিলনের সেতু তৈরি করবেন বলে ভেবেছিলেন, সেই উদ্যোগকেও তার কাছে 'বাহ্য'-এর ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। এরপর কাজী আবদুল ওদুদের 'চিত্তবৃত্তির ঔদার্য'কে হিন্দু-মুসলমানের 'মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে' বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' শিরোনামে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু লক্ষ করলে দেখব, রবীন্দ্রনাথ বা ওদুদ দুজনেই তখনো এই বিরোধের কারণ হিসেবে সরাসরি শাসকদেরকে দায়ী করেননি। এর কারণ হয়ত এই যে, এই দুজনেই মনে করতেন এ-বিরোধ ইংরেজদের আসার বহু আগে থেকেই চলে আসছে, আকবরও তা নিরসনের চেষ্টা করেছেন, আল-বিরুনিও তাঁর ভারত-বিবরণে এই বিরোধের উল্লেখ করেছেন, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক জগদীশনারায়ণ সরকারও তা স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে, এখানে, কালিদাস নাগকে লিখিত চিঠির শেষ অংশটির উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের মানসপ্রকৃতির অবরোধ ঘোচাতে না পারলে কোনোরকমের স্বাধীনতা পাব না -

> "হিন্দুমুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই— কারণ, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানুষের মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব।"[১২]

এই যুগ-পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তার জন্য সাধনার দরকার; কিন্তু কী সেই সাধনা? যেহেতু এই চিঠি ১৩২৯ বঙ্গাব্দে লিখিত, এর আগে পূর্ববঙ্গের জমিদারি কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করে শান্তিনিকেতনের কর্মময় জগতেও ঢুকে পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ, এর সঙ্গে তাঁর কথিত কল্পনাজগতের 'আসমানদারি'র অভিজ্ঞতা তো তার রয়েছেই, তাই বুঝতে বাকি থাকে না যে এই সাধনার ধরন কীরকম হতে পারে। তিনি সত্য ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির কথা বলেন, ব্রহ্মচর্যের কথাও বলেন, ধারণা করা যায় এই সবকিছুর সঙ্গে তাঁর সকল প্রকার অভিজ্ঞতার বিকিরণও যুক্ত হবে। কিন্তু তা তো এমনি এমনি হয় না, তার জন্য কোনো-না-কোনো প্রেরণা বা অভিঘাতের প্রয়োজন। একদিন ইংরেজরা এখানে এসেছিল বলে সেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রেরণার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ বারবার ইউরোপের দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর বহুলপঠিত প্রবন্ধ 'কালান্তর'-এর কথা স্মরণ করতে পারি যেখানে তিনি লিখেছিলেন - একসময় আমাদের স্থাবর মনে ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি এমনভাবে আঘাত করেছিল, যেমন দূর আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা পড়ে মাটির নিচে গিয়ে 'নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্র রূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সেই যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বের হয় হয়ে মানবেতিহাসের আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বোঝাই যায় রবীন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করবেন, কারণ সজীব মন গ্রহণ না-করে পারে না। এই রবীন্দ্রনাথই 'সভ্যতার সংকট'-এ এসে বলছেন -

> "অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্য জগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এতো বড়ো নিকৃষ্ট বিকৃত রূপ কল্পনাই করতে পারিনি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম ঔদাসীন্য।"[১৩]

এখানে একবার 'ইংরেজ' আর বাকি তিনবারই রয়েছে 'সভ্য' শব্দের উল্লেখ; বোঝা যাচ্ছে এখন আর এই সভ্য ইংরেজদের প্রতি তার আগের মোহ নেই, একান্ত মনে নিবিষ্ট হওয়ার আগ্রহও নেই। তাঁর বেশকিছু লেখায় খেয়াল করলে দেখব মানুষের দারিদ্র্য প্রসঙ্গে শাসকদের কর্তব্য বিষয়ে কথা বলার চেয়ে আত্মজাগরণ আর সমাজ-শক্তির বিকাশ বিষয়ে বেশি জোর দিয়েছেন, এখন দেখা যায়, দারিদ্র্য আর হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদ এই সংকটের জন্য সরাসরি শাসকদেরকেই দায়ী করছেন রবীন্দ্রনাথ। এই মত পরিবর্তনের কারণ 'সভ্যতার সংকট'ময় পরিস্থিতি, নাকি অন্য কিছু?

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনেক ভাবনা আমরা তাঁর বিভিন্ন লেখায় পাই। তিনি এই প্রবন্ধে ইংরেজদের উগ্রজাতীয়তাবাদ কীভাবে অবধারিতভাবে সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি লাভ করেছে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন। উনিশ শতকে ইংরেজরা যে ভাবে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতা দখল করেছিল। শাসনের নামে শোষণ করে তারা তাদের অধিকৃত রাষ্ট্রকে তাদের দাস বানিয়ে রেখেছিল। বর্তমান সময় সেই ভাবে ক্ষমতা দখল না হলেও বিভিন্ন চুক্তি, ব্যবসা, অর্থনীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করছে। আর এর ফলে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতির মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ভারতবর্ষে শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে সভ্যতার সংকট যেন এখনো প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক শুধু তার ইতিহাস-বিশ্লেষণের কারণে নয়। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের যে-ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তা আজো নির্মমভাবে সত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে যদিও আর মহাসমর সংঘটিত হয়নি, তবু এমন সময় যায়নি যেখানে আমরা মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে সংঘাত দেখিনি। এশিয়া মহাদেশ তার মূল ঘটনাস্থল, তবে ইউরোপ, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকাও তার থেকে বাদ যায়নি। বৃহৎ শক্তির লোভ মানুষের শান্তি ও সম্পদ হরণে ক্ষান্তিহীন। সভ্যতার দাবি আবার তাদেরই প্রবল। কোথাও সংঘর্ষ দেখা দিলে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে শক্তিমান দেশগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আবার তারাই যুদ্ধরত জাতিগুলোর কাছে মারণাস্ত্র বিক্রি করে সে-সংঘাতকে প্রলম্বিত করার ব্যবস্থা করছে। সভ্যজাতির ক্ষেত্রে এবং অপরের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিতের মাপকাঠি তাদের কাছে এখনো ভিন্ন। আমরা যখন যুদ্ধাপরাধের জন্যে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করি, তখন তারা আন্তর্জাতিক মানের কথা বলে বারবার। তারা যখন ওসামা বিন-লাদেনের গোপন আস্তানায় বলপূর্বক প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দেয় তখন আর কোনো মানের প্রশ্ন ওঠে না। সভ্যজাতির এই ভাবলেশহীন দ্বিচারণ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৯১৭ সালে *Nationalism* বইতে তিনি প্রথমবার পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বার্থপরতার কথা বলেছিলেন, এবং তার অনুকরণে জাপানের মতো প্রাচ্যদেশেও যে-অনাচার ঘটছিল, তার নিন্দাজ্ঞাপন করেছিলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 872 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত-শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।"[১৪]

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সভ্যতার সংকটে শেষবারের মতো মানুষের প্রতি কৃত মানুষের অবিচার-অন্যায়ের একটা সূত্রবদ্ধ পরিচয় তুলে ধরলেন এবং মানুষের ওপরেই আস্থা রাখলেন সেই সংকট থেকে মুক্তিলাভের। এসব কথা অবিনাশী, এসব কথা কালোত্তীর্ণ। যা আজ একবিংশ শতকেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

৪

ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ইংরেজরা যা করেছে সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড় নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারেননি রবীন্দ্রনাথ। অথচ এরই পাশাপাশি দেখেছেন জাপান, রাশিয়া, ইরান, এমনকি আফগানিস্তানে সর্বজনীন উৎকর্ষের সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের সমীক্ষণ হল, সভ্যতা গর্বিত কোনো ইউরোপীয় জাতি তাদের অভিভূত করতে পারেনি বলেই ওই দেশগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই উৎকর্ষের পথে এগিয়ে আসা। এভাবেই ইউরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি তিনি হারিয়েছেন তাঁর বিশ্বাস জীবনান্তিকে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে 'সভ্যতা' বলা যায় কি-না, জেগেছে সেই সংশয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় সূচনায় দাঁড়িয়ে কথিত সভ্যতার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে কতটা বিচলিত হয়েছিলেন, এই লেখাটি পড়লেই তা বোঝা যাবে। এই প্রবন্ধের বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, সারাজীবন ধরে পর্বে-পর্বে রবীন্দ্রনাথ যা ভেবেছেন তা এই একটি লেখাতেই পেয়েছে সংহত গভীর নির্মোহ বাণীরূপ। পাশ্চাত্য মূল্যবোধের প্রতি প্রবল আগ্রহ পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে গভীর অধ্যয়নে রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জ্ঞানের প্রসারতার ফলে বিবেচনাশক্তি গভীরতর হওয়ায় সব কিছুরই শক্তি ও ত্রুটি বোঝা সম্ভবপর হয়েছিল তার। সেই সঙ্গে প্রাচ্য মূল্যবোধের প্রতি ক্রমবর্ধিত জ্ঞান ও শ্রদ্ধাও দেখা দিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারত তথা এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন আত্মমুক্তির পরম সম্ভাবনা। বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা আমরা এই প্রবন্ধের পরতে পরতে লক্ষ্য করি। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত। একসময় মাছি মারা কেরানি তৈরী করার লক্ষ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। আজও এই শিক্ষাব্যবস্থা অপরিবর্তিত যা ইংরেজদের প্রতি দাসত্বের চিহ্ন বহন করে চলেছে। দীর্ঘদিন যাবত কারো অধীনে জীবনধারনের ফলে ব্যক্তি যেমন নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে, উপনিবেশিক দেশগুলোও ঠিক সেভাবে হারিয়ে ফেলে সার্বভৌম অর্জনের স্পৃহা। আজও আমরা দেখতে পাই, নিজ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি শেখার চাইতে তা ভুলে যেতেই বুঝি মানুষের আগ্রহ বেশি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারা আজকাল বড় কোন অর্জন মনে হয় আমাদের কাছে। যা ইংরেজ দাসত্বের পরিচয় বহন করে। ইউরোপ সৃষ্ট যুগ্ম-বৈপরিত্যের

ধারণা, সাবেক উপনিবেশিক দেশের নাগরিক হিসেবে আজও তা আমরা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধারণ করি। আমরা কালো-সাদা, ধনী-নির্ধন, সুন্দর-অসুন্দর ভেদে ব্যক্তি এমনকি সামাজিক পর্যায়েও ভেদাভেদ করে চলি। আমরা আজও ইউরোপ প্রবর্তিত পশ্চিমা সংস্কৃতির দাস। পশ্চিমাদের প্রবর্তিত সবকিছু আজও অনেকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়। গুটিকয়েক যারা প্রাচ্য মনোভাবে আস্থাশীল তারা আজ একঘরে। এহেন অবস্থা চলতে থাকলে আমরা হারিয়ে ফেলবো আমাদের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধ। যা আমাদের শিকড় ভুলিয়ে দিবে। এসব কিছু হারিয়ে ফেললে একটি জাতির আর কীইবা থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকটে যা ভেবেছেন সেই ভাবনা আমাদের আজ একবিংশ শতকেও নতুন করে ভাবায়।

Reference:

১. Bill Ashcroft et. al. (eds.), 1995. The Post-colonial Studies, London, p. 36-37

২. Fanon, Frantz, 2006. The Wretched of the Earth (জগতের লাঞ্ছিত : অনুবাদ – আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া, ২০১৪), ঢাকা, পৃ. ২৮

৩. Woodrow, H., 1862. Macaulay's Minutes of Education in India, Calcutta, p. 115

৪. নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, ২০১০, ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড (অনুবাদ : দুলাল আল মনসুর), ঢাকা, পৃ. ১৫

৫. Tagore, Rabindranath, The Religion of Man, The Hibbert Lecture for 1930

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সভ্যতার সংকট', রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬ পৃ. ৭৪১

৭. মেকলে, লর্ড, নির্বাচিত রচনা, আরশাদ আজিজ অনূদিত (অনুবাদকের ভূমিকা), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৯

৮. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪৪

৯. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪৬

১০. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪৬

১১. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪৬

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'হিন্দুমুসলমান', কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৬২০

১৩. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪২

১৪. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৭৪৫